**ভুলু ও মুক্তিযুদ্ধ**

চক্রবর্তীদের বাড়ির কুকুরটাকে বাড়ীর ছোট মেয়ে নাতিশা পন্ডিত বলে ডাকতে শুরু করলে, বাবা নিষেধ করলেন। কারন ওদের এলাকার ভট্টাচার্যদের বাড়িটাকে সবাই পন্ডিত বাড়ি বলতো। ওই বাড়িতেই জন্মেছিলেন অত্র এলাকার কৃতী সন্তান শ্যামাপদ বিদ্যালঙ্কার। কোলকাতায় থাকলেও মাঝে মধ্যে বাড়ি আসতেন। সবার সঙ্গে কুশল বিনিময় করতেন। নাতিশাদের পরিবারের সঙ্গে তাদের পারিবারিক ভাব ছিলো খুব। পরে পন্ডিতের নাম রাখা হয় ভুলু। ভুলু ঠিক মানুষের মতোই সব কিছুই বুঝতো, একারনেই তাকে পন্ডিত বলা। নিজের গ্রামের বাড়ীতে আসার আগ পর্যন্ত ভুলুকে পন্ডিত বলেই সবাই ডাকতো। যুদ্ধ শুরু হওয়ার কিছুদিন আগেই অসুস্থ পন্ডিতকে নিয়েই নাতিশারা গ্রামের বাড়ীতে চলে আসে।

গ্রামের বাড়িতে আসার পর হঠাৎএকদিন দেখা গেল ভুলু খুব অসুস্থ। সকাল থেকে কিছুই খাচ্ছে না। পায়ের যন্ত্রনায় খুব কাতরাচ্ছে। চোখের দুপাশ কান্নায় ভারী হয়েছিল। মাঝে মাঝে চিৎকার করে কেমন শব্দ করে উঠছিল। কুঁজো হয়ে মাটিতে বসে ছিল পুরো সকালটা। চোখ দুইটি সামনের দিকে স্থির করে খুব গভীর চিন্তায় যেন মগ্ন। ভুলুর এ অবস্থা দেখে নাতিশার বুকটা কেঁদে উঠছিল বার বার।

আজ ভুলুর কথা খুব মনে পড়ছে নাতিশার।

দেশের পরিস্থিতি তখন বদলাতে শুরু করেছে। ১৯৭০ সালে নির্বাচনে আওয়ামীলীগ অধিকাংশ আসনগুলো পেলেও ক্ষমতা বুঝিয়ে দেয়া হচ্ছিলো না। বরং ক্ষমতা বুঝিয়ে দেয়ার নামে চলছিলো আলোচনা ও কালক্ষেপন। এই কাল ক্ষেপনের মধ্যে পাকিস্তান থেকে অস্ত্র আসছিলো বাংলাদেশে। ২৫ মার্চ কাল রাত্রিতে শুরু হলো অপারেশন সার্চ লাইটের নামে গণহত্যা। সব খবর শুনে নাতিশার বাবা-মা,বড়দা খুব মন খারাপ করে থাকতো। মার্চ এর শেষ দিকেই নাতিশারা গ্রামের বাড়ীতে চলে আসে। বার বার দাউদকান্দি ফেরী ঘাটের খবর নিতো। ভিতরে ভিতরে কুমিল্লা থেকে ত্রিপুরা চলে যাওয়ার আলোচনা চলতো। পন্ডিত বাড়িতে একটা রেডিও ছিলো। তাতে খবর পাওয়া যেত কোথায় কি ঘটছে। নাতিশার ভিতরে তখন একটাই চিন্তা  কখন সেনাবাহিনী আসে। বা ওরা সবাই গ্রাম থেকে চলে গেলে ভুলু কিভাবে যাবে ওরতো পায়ে অসুখ। চারিদিকের পরিস্থিতি যখন খারাপের দিকে যাচ্ছিল তখন একদিন রাত্রে পাশের গ্রামের মৌলভী রহমত চাচার সাহায্য নিয়ে নাতিশারা সবাই ত্রিপুরা চলে যায়। কিন্তু সাথে ভুলুকে নিতে পারেনি। ভুলু টেরও পায়নি ওর প্রিয় বন্ধু নাতিশা আর ওর পরিবার ভুলুকে একলা ফেলে চলে গেছে। বেশ কয়দিন ভুলু খুব কষ্টে অসহায়ের মতো কেঁদেছে। এ পাড়া, ও পাড়া ঘুরেছে যদি খুঁজে পায়।

নয়মাস পরে ফিরে এসে নাতিশারা দেখে ভুলু আর নেই। পাশের বাড়ির মানিকদা বলেছিলেন, পাকিস্তান সেনাবাহিনী বাজারে কালি পূজার ঘরে আগুন দিলে ভুলু হামলে পড়ে পাকিস্তান সেনাদের উপরে। তারপরে ভুলুকে নৃশংসভাবে গুলি করে হত্যা করে। ভুলুর মৃত্যুর খবরটি শুনে নাতিশা হাউ-মাউ করে কেঁদেছিলো।

নাতিশার কাছে ভুলু এখন কেবল স্মৃতি।

দেখতে দেখতে দিনগুলো সপ্তাহে, সপ্তাহগুলো মাসে পরিণত হয়ে, কিন্তু ভুলুকে হারানোর বেদনা বরাবরের মতোই হদয়ে ক্ষত হয়ে জমেছিল। নাতিশা মাঝে মধ্যে ভুলুর কবরে যেত। অনেকক্ষণ বসে থাকত। চিন্তায় হারিয়ে যেত। যে বন্ধুকে সে হারিয়েছে তার জন্য দুঃখে তার হদয় ভারাক্রান্ত হয়ে থাকত। ভাবলেই চোখে জল এসে যেত। নাতিশা এবং তার পরিবারের জন্য ভুলুর চলে যাওয়াটা ছিল খুব কষ্টকর, বেদনাদায়ক। ভুলুর অনুপস্থিতিটা আজ বাড়ির সকলেই টের পাচ্ছে। ভুলুর জন্যই এক সময় বাড়িটা থাকত হৈচৈ- এ মাতোয়ারা। আজ সেখানে নীরব শূন্যতা, কেমন খালি খালি মনে হয় বাড়ির চারিদিক।

গ্রামে ফিরে আসার আগ পর্যন্ত ভুলুর নাম ছিল পন্ডিত। এই নামেই আগে পরিবারের সবাই ভুলুকে ডাকত। বাবাই এই নামটা দিয়েছেন। তবে নাতিশাই একদিন বাবাকে ডেকে বলেছিল-

নাতিশা: দেখ, দেখ, বাবা। আমাদের এই কুকুরটা যেন পণ্ডিত। আমার সব কথাই যেন ও বুঝতে পারে। দেখ, দেখ, এই বলেই নাতিশা ডাকে: পণ্ডিত, এই দিকে এসো। আমার সামনে এসে বসো।

নাতিশার কথা শুনেই কুকুরটি লেজ নাড়তে নাড়তে নাতিশার সামনে এসে বসে। মুখ তুলে নাতিশার দিকে তাকায়। পরবর্তী নির্দেশনার জন্য।

বাবা: ওরে বাপরে বাপ! এত দেখছি সত্যিই পণ্ডিত! এতকিছু ও বুঝে? তুই তো দেখছি ওকে অনেক কিছুই শিখিয়েছিস।
নাতিশা: হ বাবা। ও অনেক কিছু জানে। ও মানুষের মতো আদব-কায়দা শিখেছে। তবে বলতে পারে না। কিন্তু জানো বাবা, অনেকভাবে বুঝানোর চেষ্টা করে। এই বলেই পণ্ডিতকে বলে- পণ্ডিত, বাবাকে প্রণাম করতো।

সাথে সাথে কুকুরটি সামনের দু’পা তুলে প্রণাম করে। নাতিশার বাবা সেদিন সত্যিই অবাক হয়ে যায়।

বাবা: ঠিকই বলেছিসরে মা। ও সত্যিই পণ্ডিত। আজ থেকে ওর নাম পণ্ডিত। এই বলেই সবাইকে ডাকাডাকি শুরু করে। শোন, আজ থেকে কেউ কিন্তু ওকে কুকুর বলে ডাকবে না। আজ থেকে সবাই ওকে পণ্ডিত বলে ডাকবে।

সেদিন থেকেই বাড়ির সবাই ওকে পণ্ডিত বলেই ডাকে।

ঘুম থেকে উঠেই পণ্ডিতকে প্রথম দেখতে আসত নাতিশা। দু’হাতে পণ্ডিতের মাথায় হাত বুলিয়ে দিত। কিছুক্ষণ থেকে তারপর নিজের কাজে মনযোগ দেয়। স্কুলে যাওয়ার আগে পণ্ডিতকে নিজের হাতে খাওয়াবে, গায়ের চুল আচড়িয়ে দেবে এবং কিছুক্ষণ পণ্ডিতকে নিয়ে থানার মাঠে হাঁটতে যাবে। স্কুল থেকে এসে প্রথমেই পণ্ডিতকে দেখতে যাবে। তবে কিছুদিন পর পণ্ডিতই বাড়ির গেটের সামনে নাতিশার জন্য অপেক্ষা করে। ও ভালো করেই জানে ওর বন্ধু নাতিশার স্কুলের টাইম-টেবল। কখনও-সখনও পণ্ডিতকে না দেখতে পেলে নাতিশা ডাকতে থাকে-

-পণ্ডিত, পণ্ডিত, আমি এসে গেছি। তাড়াতাড়ি এসো।

বাড়ির যেখানেই থাকুক লেজ নাড়তে নাড়তে পণ্ডিত এসে হাজির হবে এবং মাথাটা নাতিশার পায়ের সামনে ফেলে দেবে। নাতিশা তখন পণ্ডিতের মাথায় দু’হাত বুলিয়ে ডাকবে- ঠিক আছে, ঠিক আছে পণ্ডিত। তুমি কেমন আছো?

পণ্ডিত তখন লেজ নাড়িয়ে আর চক্ষু বন্ধ করে ভালো থাকার সংকেত দেবে।

গত চার বছর ধরে এ যেন ছিল নাতিশার নিত্যদিনের ঘটনা।

যুদ্ধ শুর হওয়ার আগে রংপুরের মিঠাপুকুর থানায় থাকত নাতিশারা। বাবা ছিলেন থানার ওসি। তাই থানার কোয়ার্টারেই থাকত। নাতিশা সবার ছোট। বাড়িতে নাতিশারা আটজন। বড়ো দুই ভাই, দুই বোন এবং বাবা-মা। জয়ন্তী হলো সংসারের আট নম্বর সদস্য। কাজের মেয়ে বলা যাবে না। এতে বাবা খুব রাগ করেন। নাতিশার জন্মের অনেক আগ থেকেই এই সংসারের সাথে আছে জয়ন্তী। এই পৃথিবীতে আপন বলতে ওর আর কেউ নেই। দশ বছরে বাবাকে হারায়। বছর ঘুরতে না ঘুরতে মাও একদিন কয়েক ঘণ্টার ডায়রিয়ায় গত হন। সেদিন জয়ন্তী খুব কেঁদেছিল।

এগার বছর বয়স থেকেই গ্রামের এক বাড়িতে থাকার আশ্রয় পায়। তবে বাড়ির সব কাজে হাত দিতে হতো জয়ন্তীকে। নাতিশার বাবা যখন জয়ন্তীকে এই বাড়িতে নিয়ে আসে তখন ওর বয়স ছিল বিশের কোঠায়। এখনও বিয়ে করেনি এবং কখনও বিয়ে করবে না বলে সাফ নাতিশার বাবাকে জানিয়ে দিয়েছে। এ বাড়ি ছেড়ে আর কোথাও যাবে না। এখন বয়সও চলি­শের কোঠায়। এই বাড়ির লোকজন ওর আত্মার আত্মীয়। পরিবারের সবাই ওকে নিজেদের একজন হিসেবেই ভাবে। সকলে ওকে জয়ন্তী বলে ডাকলেও নাতিশা সবসময় জয়ন্তীদি বলে সম্ভোধন করে। দিদি নামটা শুনলে জয়ন্তীর মনটা খুশিতে ভরে যায়। নাতিশাকেও জয়ন্তী নিজের ছোট বোনের মতোই ভালোবাসে।

মিঠাপুকুরে নাতিশারা আছে প্রায় তিন বছর হতে চলল। এর আগে ছিল সুজানগর। বাবা পুলিশে কাজ করেন বলে কয়েক বছর পরপরই অন্য জায়গায় বদলি হতে হয়। পণ্ডিতও পরিবারের সাথে সাথে নতুন জায়গায় যায়। মিঠাপুকুর থানা ও এর আশপাশের জায়গাটা নাতিশার খুব পছন্দের। থানার বাজারটা বেশ বড়। প্রতি সপ্তাহে সাপ্তাহিক হাট বসে। সে দুদিন বাজারে মানুষে গিজগিজ করে। তাছাড়া সপ্তাহের অন্য দিনগুলো বেশ ছিমছাম থাকে। কম লোক থাকে বলে চলাফেরায় খুব সুবিধা। বাজারের মধ্য দিয়ে নাতিশার স্কুলে যেতে হয়। এবার ক্লাশ টেনে পড়ে। সামনের বছরই মাধ্যমিকের পরীক্ষা। তবে লেখা-পড়ায় নাতিশা বরাবরই ভালো।

এই এলাকাটার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য খুবই মনকাড়া। চারিদিকে শুধু সবুজের শ্যামলিমা। এখানকার মাটি বেশ উর্বর। তাই ফসলি জমি চারিদিকে। সারি সারি সবুজ ধানের জমিগুলোর পাশ দিয়ে পণ্ডিতকে নিয়ে নাতিশা মাঝে মাঝে হাঁটতে বেরোয়। চলাফেরায় কোনো ভয় নেই। তাছাড়া থানার ওসির মেয়ে বলে আশপাশের সবাই নাতিশাকে চেনে।

 মেঠোপথ দিয়ে হাঁটতে পণ্ডিতের খুব ভালোই লাগত। নাতিশা চারিদিকের দৃশ্যে ডুবে যেত। বিস্তৃত ধানের ক্ষেত যতদূর চোখ যায় প্রসারিত। তবে নাতিশার ও পণ্ডিতের সবচেয়ে পছন্দের জায়গাটি হলো নৈসর্গিক তিস্তা নদী। থানার একপাশ দিয়ে আঁকা-বাঁকা হয়ে চলে গেছে তিস্তা। নদীটিই যেন এই এলাকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে বাড়িয়ে দিয়েছে। নদীটির পাশ দিয়েই খুব সুন্দর মেঠোপথ। এই পথ দিয়েই পণ্ডিতকে নিয়ে নাতিশা হাঁটতে খুব পছন্দ করত।

তাদের পোষা কুকুর পণ্ডিতের প্রতি অসাধারণ ভালবাসা ছিল সকলের। পণ্ডিত তাদের কাছে শুধু একটি কুকুর নয়। যেন পরিবারের একজন বিশ্বস্ত সঙ্গী।এই পণ্ডিতই  যেন তাদের ঘরকে উষ্ণতা ও আনন্দে পূর্ণ করে রেখেছে। বিশেষ করে নাতিশার জন্য পণ্ডিত যেন একটি বিশ্বস্ত খেলার সাথী। নাতিশার সাথে প্রতিদিন স্কুলে যেত পণ্ডিত। সাথে যেত জয়ন্তী। পণ্ডিতের ভয়ে দুষ্ট ছেলেরা সুন্দরী বনলতা কেশী নাতিশার দিকে চোখ তুলেও তাকাত না। বরং পণ্ডিতকে দেখে সবাই অবাক হয়ে যেত।

নাতিশা সকলের ছোট বলে সে ছিল সকলের চোখের মণি। চোখ ছিল সবসময় ঝলমলে। হাসিতে ছিল সৌন্দর্যের ছোঁয়া। পণ্ডিতের কাছে নাতিশা ছিল সবচেয়ে প্রিয়। নাতিশার সাথে থাকতে পণ্ডিত সবচেয়ে বেশি পছন্দ করত। থানার কোয়র্টারে পাশেই ছোট্ট একটি আরামদায়ক কোন ছিল। সাথেই লাগোয়া একটি ছোট্ট ঘর। খোলা পাশের জায়গাটিতে পণ্ডিত প্রায় সময় সূর্যের আলোতে শান্ত হয়ে শুয়ে থাকত। তবে চোখ থাকত সদাসতর্ক। সজাগ দৃষ্টিতে কোলাহলপূর্ণ আশপাশের দিকে নজর রাখত। কোনো অজানা লোক দেখলেই ঘেউ ঘেউ করে উঠত। আশপাশের শিশুরা প্রায়ই পণ্ডিতের সাথে খেলার জন্য জড়ো হতো। শিশুরাও ওর সাথে ইনিয়ে-বিনিয়ে কথাবার্তা বলত। পণ্ডিতের বুদ্ধিমত্তা আর আনুগত্যে সকলেই বিস্মিত হতো।
নাতিশার বয়স বাড়ার সাথে সাথে সে এবং পণ্ডিত আরও ঘনিষ্ঠ হতে থাকে।

নাতিশা পণ্ডিতকে অনেক কিছু শেখাত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা নানা ইশারা-ইঙ্গিতে আদব-কায়দা ও কৌশল শেখাত। পণ্ডিতও খুব মনযোগ দিয়ে তানিশার কথাগুলো শুনত। দুজনের মধ্যে ছিল মহাভাব। তারা একসাথে মাঠে ঘুরে বেড়াত, প্রজাপতিদের তাড়া করত এবং কখনও-সখনও নরম ঘাসে গড়াগড়ি দিত। তাদের হাসির কলকলানি গাছের পাতার তির তির দোলায় আর দূর থেকে ভেসে আসা পাখিদের ডাকে মিশে যেত।

একদিন হাঁটতে গিয়ে পণ্ডিত পথ দিয়ে হেঁটে চলা একটি কুকুরকে তাড়া করে। ভয়ে ওই কুকুরটি নদীতে গিয়ে পড়ে। এতে নাতিশার খুব রাগ হয়। বাড়ি আসা পর্যন্ত পুরো রাস্তায় একটিও কথা বলেনি পণ্ডিতের সাথে। পণ্ডিত বুঝতে পারছে  যে বন্ধু নাতিশা ওর কাজে খুশি নয়। তাই বার বার ওর দিকে তাকাচ্ছিল অসহায়ের মতো।

পণ্ডিত যখন বিচলিত থাকে, তখন তার আচরণে একটি সূক্ষ্ম পরিবর্তন দেখা যায়, যা তার অস্বস্তি বা অসন্তুষ্টির ইঙ্গিত দেয়। তার শরীরের ভাষা টানটান হয়ে উঠে। তার পেশিগুলো এমনভাবে কুণ্ডলিত হয়ে উঠে যেন এক মুহূর্তের নোটিশে  যেকোনো অঘটন ঘটাতে প্রস্তুত। চিন্তায় বা দুঃখে তার লেজ নিচু এবং শক্ত হয়ে যায়। পণ্ডিতের কান তার মাথার দিকে চ্যাপ্টা করে ধরে রাখবে। তার দৃষ্টিতে কেমন অসারতার ভাব থাকে। এই সবকিছু তার দুঃশ্চিন্তার চিহ্ন। মাঝে মধ্যে তার হতাশা প্রকাশ করার জন্য তীব্রভাবে ঘেউ ঘেউ করে। বাড়িতে আসার পর নাতিশা সেটা লক্ষ্য করল।

বাড়িতে ঢুকেই পণ্ডিত নিজের জায়গায় চলে যায়। কুণ্ডলী হয়ে গাটা মাটিতে এলিয়ে দেয়। এমন সময় নাতিশা একটা ঝাড়ু নিয়ে আসে। নাতিশা পণ্ডিতের দিকে আসছে দেখে পণ্ডিত বেশ ঘাবড়ে যায়। দু’পায়ে ভর করে উঠে বসে।
নাতিশা: পণ্ডিত! এসব কি অসভ্যতা! তোমাকে কতবার বলেছি অন্যকে তাড়া করবে না। আজ কেন তাড়া করলে?

পণ্ডিত নিরহের মতো নাতিশার দিকে তাকায়। সামনের দু’পা তুলে ধরে। যেন করজোরে ক্ষমা চাচ্ছে।

নাতিশা: খারাপ কাজ করবে আর ক্ষমা চাবে, না? এ বলেই ঝাড়– দিয়ে পণ্ডিতকে মারতে যায়। পণ্ডিত খুব অসহায়ের মতো তাকিয়ে থাকে। নাতিশা দেখতে পেল পণ্ডিতের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। পরক্ষণেই নাতিশা পণ্ডিতকে জড়িয়ে ধরে, আদর করে, মাথায় চুমু খায়। পণ্ডিতও খুশিতে লেজ নাড়াতে থাকে।

নাতিশা লক্ষ্য করল পণ্ডিতের চোখ দুষ্টুমি এবং আনন্দে জ্বলজ্বল করছে। কান দুটি ঘন ঘন নাড়াচ্ছে। আনন্দে ও উত্তেজনায় পণ্ডিত ধীরে ধীরে মাটিতে ধাক্কা দিচ্ছে।  কৌতুকপূর্ণভাবে ঘেউ ঘেউ করছে। পণ্ডিত যে এখন খুশি এ সবই তার বহিঃপ্রকাশ। খুশিতে তার কণ্ঠস্বর থাকে উৎসাহে ভরা, যেন আশপাশের সবাইকে তার সুখে যোগ দিতে আমন্ত্রণ জানায়। পণ্ডিতের শারীরিক ভাষা তার আবেগকে প্রতিফলিত করে।

নাতিশা পণ্ডিতকে ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেই পণ্ডিত শূন্যে লাফ দিতে থাকে। একবার, দু’বার, তিনবার। এ যেন নাতিশা দড়ি দিয়ে স্কিপিং বা লাফ দেয়ার মতো। পণ্ডিতের আলামত দেখে নাতিশা খিলখিল করে হাসতে লাগল। দূর থেকে জয়ন্তীও এদের আনন্দের সময়টাকে উপভোগ করছিল প্রাণভরে।

খুব ভালোভাবেই কেটে যাচ্ছিল নাতিশা-পণ্ডিতের দিনগুলো।

কিন্তু হঠাৎ একদিন তাদের খুশিতে নেমে আসে দুঃখের ঘনঘটা। অপ্রত্যাশিত ভাবেই। একটা দুর্ভাগ্যজনক দিন ছিল সেটা। ছুটির দিন ছিল সেদিন। তিস্তার পারেই একটা ছোট্ট বন ছিল। সেখানে হাঁটতে হাঁটতে পণ্ডিতকে নিয়ে যায় নাতিশা। সে বনে হাঁটতে গিয়েই বিপর্যয়টা ঘটে। যদিও আগে অমনকবার শুনেছে যে নদীর পারের বন থেকে বুনো শুয়োর এসে গ্রামে মাঝেমধ্যে ঢুকে পড়ে। নাতিশা সেটা যেন বেমালুম ভুলে যায়। তাই হাঁটতে হাঁটতে জঙ্গলের ভেতরে চলে যায়। তবে বেশি ভেতরে যায়নি। বনের ধারের কাছ দিয়েই হাঁটছিল আর পাখিদের কিচিরমিচির আওয়াজ উপভোগ করছিল।

একটি বন্য শুয়োর তাদের উপস্থিতি দেখে চমকে উঠে। ক্ষিপ্ত অভিপ্রায়ে তাদের দিকে তেড়ে আসে। নাতিশা দেখেই ভয়ে দৌড় দেয় আর ডাকতে থাকে: পণ্ডিত, পালা, পালা….

কিন্তু বুনো শুয়োর অতিবেগে দৌড়িয়ে নাতিশার পায়ে কামড় দিতে যাবে ঠিক এমন সময় পণ্ডিত শুয়োরের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং আক্রমন শুরু করে। নাতিশা পণ্ডিতের তড়িৎ আক্রমণে অবাক হয়ে যায়। ভয়ে কাঁপতে থাকে। আজ পণ্ডিত না থাকলে হয়তো ওর মহা সর্বনাশ হয়ে যেত।

নাতিশার চিৎকারের শব্দ বাতাসে ভেদ করে যখন পেছনে থাকা পণ্ডিতের কানে স্পর্শ করে তখনই পণ্ডিত নাতিশাকে রক্ষার জন্য সাহসিকতার সাথে হিংস্র জন্তুটির মুখোমুখি হয়। ওদের হট্টগোল শুনে থানা এবং আশপাশ থেকে  লোকজন ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে যায়। নাতিশা ও পণ্ডিতের কাছে পৌঁছানোর আগেই ক্ষতি হয়ে গেছে। পণ্ডিত মাটিতে যন্ত্রনায় শুয়ে পড়ে। যন্ত্রনায় বেশ কাতরাচ্ছিল। বুনো শুয়োরের নৃশংস আক্রমণে তার ডান পা দিয়ে তখন খুব রক্ত ঝড়ছিল। ঘাড়ের দিকেও কয়েকটা কামড়ের দাগ। মানুষের হট্টগোলের আওয়াজ শুনেই হিংস্র শুয়োরটি পালায়।

খবর শুনে থানা থেকে নাতিশার বাবাও দৌড়ে এলেন। মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন আর বলতে লাগলেন- তোর কিছু হয়নি তো মা?

নাতিশা: আমার না, পণ্ডিতকে কামড়িয়েছে।

বাবার কাছ থেকে নিজকে সরিয়ে নিয়ে দৌড়ে এসে পণ্ডিতকে ধরে। তার দু’বাহুতে পণ্ডিতের দেহকে জড়িয়ে ধরে। পণ্ডিতের কষ্ট দেখে নাতিশা কান্নায় ভেঙে পড়ল।

তাড়াতাড়ি সবাই পণ্ডিতকে বাড়িতে নিয়ে যায়। পশুর ডাক্তারকে খবর  দেয়া হলো। ডাক্তার এসেই একটা ইঞ্জেকসান দিলেন। ভালো করে পণ্ডিতকে দেখলেন, তারপর বাবার কাছে গিয়ে ফিসফিস করে বাবাকে কি যেন বললেন। হঠাৎ করেই বাবার মুখটা কেমন ফ্যাকাসে হয়ে গেল। কোনো এক অজানা আশঙ্কা টের পেল নাতিশা। বুকটা কেমন ধক করে উঠল।

সেইদিন পুরো বিকালটা নাতিশা পণ্ডিতের পাশে বসেছিল। তার ছোট্ট হাতটি আলতো করে পণ্ডিতের পশমে বুলাচ্ছিল। নাতিশার চোখ দিয়ে তখন অশ্র“ ঝরছিল। নাতিশা যদি পণ্ডিতকে জঙ্গলে না নিয়ে যেত তাহলে হয়তো আজকে এই বিপদটা হতো না। পন্ডিতের কষ্টের জন্য নিজকেই অপরাধী মনে হতে লাগল।

পণ্ডিত নাতিশার এই নীরবতা বুঝতে পারছিল। পণ্ডিত যেন নাতিশার সবকিছুই বুঝতে পারত। চোখের ইশারা, মুখের ভাষা। হঠাৎ পণ্ডিতের মাথার উপর বন্ধু নাতিশার চোখের জল টপ করে পরে। পন্ডিতের বুঝতে আর বাকি রইল না যে ওর জন্য নাতিশা কাঁদছে।

পণ্ডিত এবার খুব দুর্বলভাবে মাথা তুলল। দৃষ্টি ফিরাল নাতিশার দিকে। চোখ দুটি বেদনায় ভরে উঠল। কান দুটি ঘুরাতে লাগল। এবার নাতিশার দিকে ঘুরে বসল পণ্ডিত। সামনের ডান পা দিয়ে নাতিশার পায়ে ঘষা দিল, যেন বলছে: ‘কাঁদো না, বন্ধু’, চাহনিতে কি বিষাদের ছায়া। তার কণ্ঠে মৃদু গর্জন। ‘আমি এখন তোমার সাথে আছি।’ তার পর মাথাটা নাতিশার দু’পায়ের উপর রাখল।

নাতিশা এবার হাঁটু গেড়ে বসে। পন্ডিতের কান্না থামানোর চেষ্টা করে। ডানহাত বুলোতে থাকে পণ্ডিতের মাথায়। ফিসফিস করে বলতে থাকে- ‘কিন্তু তুমি যে খুব কষ্ট পাচ্ছো, পণ্ডিত,’ আবেগে তার কণ্ঠ কাঁপছে। ‘আমি তোমাকে হারাতে চাই না। আমার জন্য আজ তোমার কষ্ট হচ্ছে’

পণ্ডিত তার ডান পা নাড়াল, কান ঘুরাল। তার ঠোঁটে যেন মৃদু হাসি। সামনের দাঁতগুলো দেখা গেল ‘তুমি আমাকে হারাবে না, বন্ধু,’ নাতিশার দিকে তাকিয়ে এই কথাই যেন শুনাল এবং আশ্বস্ত করল নাতিশাকে। তার চোখ উষ্ণতা এবং আশ্বাসে ভরা। ‘আমি সবসময় তোমার পাশেই থাকব, যাই ঘটুক না কেন। আমি তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাব না’- এই কথার অভিব্যাক্তিই যেন প্রকাশ পেল নাতিশার কাছে।

নাতিশা পণ্ডিতকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে আছে। পাশে জয়ন্তীও দাঁড়িয়ে ছিল। নাতিশার মুখ পণ্ডিতের পশমের মধ্যে চাপা দিয়ে ডুকরে কাঁদছিল। ‘আমাকে কথা দাও, পণ্ডিত,’ সে অনুনয় করে যেন পন্ডিতের কানে কানে বলছিল। ‘আমাকে কথা দাও তুমি কখনও আমাকে ছেড়ে যাবে না।’

তার কণ্ঠে হতাশা দেখে পণ্ডিতের হদয় হুহু করে উঠল। চোখ দুটি অশ্র“তে ভরে গেল। মাথাটা নাতিশার পায়ে ঘষাতে লাগল। তারপর মাথাটা তুলে নিদার দৃষ্টিতে নাতিশার দিকে তাকিয়ে হাত দুটো করজোড়ে তুলে ধরল। ‘আমি কথা দিচ্ছি, বন্ধু’ সে বিড়বিড় করে এই কথাগুলো যেন বলছিল।

নাতিশার সেবা যত্ন আর পশু ডাক্তারের চিকিৎসায় একদিন পন্ডিত ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠল। নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাড়াল। হাঁটা-চলা শুরু করল। ডাক্তার বলেছে মাস দুয়েক লাগবে পুরোপুরি সুস্থ হতে। ঠিক মতো যেন যত্ন নেওয়া হয়।

হঠাৎ করেই দেশের পরিস্থিতি বদলাতে শুরু করে। ২৫শে মার্চের কয়েক দিন পর পাশের থানা পাকিস্তানি সেনারা আক্রমন করে। আশে-পাশের গ্রামে গন্জে সেনাদের আনাগোনা বেড়ে যাচ্ছে। গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিচ্ছে। একদিন নাতিশারা সবাই নিজেদের গ্রামের বাড়িতে চলে আসে।

এই সব কিছুই যেন নাতিশার চোখের পর্দায় সেলুলয়েডের ফিতার মতো ভেসে উঠছে।

যুদ্ধ শেষে গ্রামের বাড়িতে এসে পন্ডিতের অর্থাৎ ভুলুর খবর শুনে জোড়ে চীৎকার দিয়ে উঠলো নাতিশা-

ভুলু…ভুলু…..।

পাশে তখন নাতিশার বাবা, মা আর বড়ো দু’বোন দাঁড়িয়ে ছিল।

পশ্চিম আকাশটা তখন লাল টুকটুকে হয়ে জ্বলছে। মাথার উপর দিয়ে কিছু কাক কা কা করে পতপত করে উড়ে গেল।

**ড. পল্টু দত্ত**

শিক্ষক, গবেষক এবং কলামিষ্ট